১০। পরিবেশগত নীতিবিদ্যার বিকাশ বা উন্মেষ (Developing an environmental ethic)

কোন বিশেষ সমাজে যে-সব নৈতিক গুণ প্রশংসিত এবং যে-সব নৈতিক বিধি-নিষেধ (ethical prohibitions) সমাজ কর্তৃক গৃহীত সেগুলি সবসময়ই মানুষকে কী অবস্থাধীনে বসবাস করতে হবে এবং বেঁচে থাকার জন্য কাজ করতে হবে তাকে প্রতিফলিত করে। এই বিবৃতিটি, পিটার সিঙ্গারের মতে, স্বতঃসত্যের (tautology) খুবই কাছাকাছি, কারণ, বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তাকে যদি কোন সমাজের নীতি বিবেচনা না করে, তাহলে সেই সমাজ টিকে থাকতে পারে না। বর্তমানকালে আমরা যেসব নৈতিক মানদণ্ড বা আদর্শ (moral standards) গ্রহণ করে থাকি তার অনেকগুলিই ঐ শর্তগুলির নিরিখে ব্যাখ্যাত হতে পারে। এগুলির কোন কোনটি সর্বজনীন এবং বস্তুত যে-কোন অবস্থাতেই মানুষ বাস করুক না কেন তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই মানদণ্ডগুলি জনসমষ্টি বা সম্প্রদায়ের পক্ষে উপকারী। "প্রতিটি সমাজেই এমন কিছু কর্তব্য-নীতি আছে যা একান্তভাবেই অনুসরণীয়। স্পষ্টতই যে-সমাজে কোন সম্প্রদায়ের সদস্যরা একে অন্যকে হত্য করার অনুমোদন পায়, সেই সমাজের দীর্ঘদিক টিকে থাকতে পারে না। বিপরীতভাবে, সন্তান প্রতিপালন এবং সততা, গোষ্ঠী বা সমাজের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি সদ্‌গুণ (virtues) স্থায়ী সমাজ গঠনের অনুকূল।"[২৫] বিশেষ পরিবেশের মধ্যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করেই মানুষ তার ভালো-মন্দের, উচিত-অনুচিতের বোধ নির্ধারণ করেছে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যবহারিক জীবন-যাপনের মধ্য দিয়েই মানুষের নীতিবোধের উন্মেষ ঘটেছে।

বর্তমানকালে আমরা আমাদের অস্তিত্বের পক্ষে একটি নতুন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। বিশ্বের নিরন্তর জনস্ফীতি এবং এরই সঙ্গে যুক্ত অর্থনৈতিক বিকাশের উপ-পণ্য (by-products) কেবলমাত্র আমাদের সমাজ নয়, অন্য যে-কোন সমাজকে বিলুপ্ত করতে সমর্থ। এই সঙ্কটের মোকাবিলা করার মতো কোন নীতিবিজ্ঞান এখনও বিকশিত হয়নি। কিছু নৈতিক বিধি (ethical principles) যা আমাদের আছে সেগুলি আমাদের যা প্রয়োজন তার ঠিক বিপরীত। সমস্যাটা হলো এই যে, নৈতিক বিধিগুলির পরিবর্তন ঘটে খুব ধীরে এবং নতুন পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞান বিকশিত করার জন্য সময় খুবই কম।

১৯৫০ সালের সময়কাল থেকে এক নতুন নীতিবিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে—পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞান। পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞানের অনুকূল পরিস্থিতির অভাব ছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে মানুষকে জগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যে একটি সুউচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে, কারণ, মানুষকে ঈশ্বর নিজের অনুকরণে সৃষ্টি করেছেন। বাইবেলে সৃষ্টিতত্ত্বের যে বর্ণনা রয়েছে তা বিচার করলে দেখা যায় সেখানে একমাত্র মানুষই নৈতিক জগতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সমস্ত জগতকে পদানত করার এবং সর্বময় কর্তৃত্ব ভোগ করার অধিকার মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকেই লাভ করেছে। জেনেসিস্ নামক ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, ঈশ্বরই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। ঈশ্বর বলেছেন, আমি আমার অনুকরণে মানুষ সৃষ্টি করব যে সমুদ্রের মাছের ওপর, আকাশের পাখির ওপর, মাটির ওপর, গবাদি পশু, বন্যজন্তু ও সরীসৃপের ওপর প্রভুত্ব করবে। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট মানুষকে আশীর্বাদ করেছেন যে, তারা যেন সৃষ্টির সকল স্বার্থকে পদানত করে।[২৬] পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে মানুষ যেন বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছু থেকে স্বতন্ত্র; সে যেন প্রকৃতির ঊর্ধ্বে। জন পাসমোর এই প্রসঙ্গেই বলেছেন যে, পাশ্চাত্য ভাবধারায় পরিবেশগত নীতিবিদ্যার জন্ম হতে পারেনা।

নতুন যে পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞানের বিকাশ বা উন্মেষ ঘটেছে তার মূল কথা হলো, মানুষ প্রকৃতিরই অংশ। প্রকৃতি-পরিবেশ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব ভাবা যায় না। সুতরাং মানুষ অবশ্যই এমন কর্ম করা থেকে বিরত থাকবে যে-সব কর্মের ফলে প্রকৃতি-পরিবেশের অনাবশ্যক ক্ষতি হয়। এটাই হবে মানুষের সঙ্গে প্রকতি পরিবেশের নৈতিক সম্পর্ক। এই নীতিবিজ্ঞানের পরিধি মানুষ-কেন্দ্রিক নীতিবিজ্ঞানের পরিধির চেয়ে অনেক ব্যাপক। পিটার সিঙ্গার এজন্যই বলেছেন,

মোটরগাড়ি চালানোর দ্বারা যে নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় তার গুরুত্ব যৌন আচরণের দ্বারা যে নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় তার গুরুত্বের চেয়ে অনেক বেশি। পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞান অর্থসঞ্চয়, সম্পদ পুনর্গঠন, খাদ্য ও অনুরূপ সংস্থানগুলিকে রক্ষা করাকে নৈতিক গুণ বা সদ্‌গুণ বলে গণ্য করে, কিন্তু এগুলির অপব্যয়ী ব্যবহারকে নৈতিকভাবে অন্যায় বলে বিবেচনা করে। পরিবেশগত নীতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের আমোদ-প্রমোদের বা চিত্তবিনোদনের জন্য উপায় বা ব্যবস্থা নির্বাচন নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ নয়। পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞান অনুসারে, স্থলপথে মোটর বাইক এবং জলপথে মোটর বোট ব্যবহার করা অনুচিত কর্ম, কারণ, তাতে খনিজ তেল, যেমন, পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় বলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পায়, জল ও বায়ু দূষিত হয়। প্রকৃতি-পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। সেজন্য স্থলপথে সাইকেল এবং জলপথে দাঁড়বাহিত নৌকা ব্যবহার করা উচিত কর্ম, কেননা, তা পরিবেশকে দূষিত করে না। জল ও বায়ুকে দূষণমুক্ত রাখতে হলে স্থলে মোটরগাড়ি চালানো, জলে স্কাইং করা নৈতিকভাবে অনুচিত কর্ম বলেই গণ্য হবে। পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞানে নিষিদ্ধ যৌন আচরণ মন্দ বা অনুচিত কর্ম বলে বিবেচিত হলেও পেট্রোল চালিত/ডিজেল চালিত যানে ভ্রমণসুখ লাভ করা অধিকতর মাত্রায় মন্দ বা অনুচিত কর্ম বলে বিবেচিত হবে যদি তা অহেতুক ভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে। বস্তুত, এখানে 'ভালো' 'মন্দের' নির্ধারক পরিবেশ, অন্য কিছু নয়।

পিটার সিঙ্গার পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞানের একটি রূপরেখা চিহ্নিত করাকে সহজ কাজ বলেই গণ্য করেছেন। একেবারে মৌলিক স্তরে পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞান সংবেদনশীল সকল প্রাণীর স্বার্থরক্ষা করার কথাই বিবেচনা করে; শুধুমাত্র এই প্রজন্মের প্রাণীদের কথাই নয়, ঐ প্রাণীদের দূর ভবিষ্যত প্রজন্মের কথাও বিবেচনা করে। এই নীতি-বোধের সঙ্গে যুক্ত হয় নির্জন বনাঞ্চল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পিপাসুদের নান্দনিক অভিজ্ঞতা। পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞান, পিটার সিঙ্গারের মতে, উপযোগবাদের সামগ্রিক ভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞান বস্তুতান্ত্রিক সমাজের (materialist society) আদর্শকে বর্জন করে, ভোগ্যপণ্যের প্রতি মানুষের আসক্তিকে সমর্থন করেনা। এর পরিবর্তে পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞান মনে করে যে, মানুষের জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে তার সামর্থ্যের বিকাশ, বাস্তব সাফল্য এবং আত্মসন্তোষের ওপর। এই নীতিবোধ মানুষকে মিতব্যয়ী হতে নির্দেশ দেয়, কেননা, অমিতব্যয়িতা প্রকৃতি পরিবেশের

ক্ষতিসাধন করে। এই নীতিবোধ মানুষের প্রয়োজন বোধকে সীমিত রাখতে নির্দেশ দেয়। 'প্রয়োজন' এবং 'একান্ত প্রয়োজন' এর ভেদরেখা চিহ্নিত করে মানুষকে কেবল তার 'একান্ত প্রয়োজন' নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ দেয় এই নীতিবোধ। "কোন বস্তুকে অযত্নে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার অর্থ সেই বস্তুটির ক্ষতিসাধন করা, অথবা বিশ্বে আমাদের যে সাধারণ সম্পদ আছে তা চুরি করা, অথচ সেই বস্তুটি হয়ত পুনরায় চক্রাকারে বন্টন করা যেতো। আমরা আমাদের বিশ্বকে রক্ষা করতে পারি যদি পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ (environmentally friendly) লভ্য পণ্যদ্রব্য আমরা কিনি এবং যে-সকল দ্রব্য ব্যবহার করি সেগুলিকে যদি চক্রাকারে ছড়িয়ে দিই..। এটা নতুন নীতিবিজ্ঞানের দিকে একটা পদক্ষেপ।"[২৭]

পরিবেশের সুরক্ষার প্রয়োজনে আমাদের খাদ্যবস্তু সম্পর্কে সংযমী ও মিতব্যয়ী হতে হবে। মানুষের অতিরিক্ত আমিষ-প্রীতি কীভাবে পরিবেশ দূষণের কারণ হয়, পিটার সিঙ্গার তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[২৮] আমিষ খাদ্যের প্রয়োজনকে সংযত রাখা উচিত; প্রয়োজন সংযত হলে মাত্রাধিক পশুপালনের প্রয়োজন হবে না, বনাঞ্চল ধ্বংসের প্রয়োজন হবে না, আর সেক্ষেত্রে পরিবেশও সুরক্ষিত থাকবে। মানুষের মাত্রাধিক লোভ ও প্রয়োজন যাতে পরিবেশকে বিনষ্ট করে মানুষের এবং প্রাণীজগতের বিপন্নতা না নিয়ে আসে তার জন্য পরিবেশগত নৈতিকতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

অপচয় ও দূষণ বন্ধ করার জন্য মিতব্যয় এবং সরল জীবন যাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলে পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞান। এর অর্থ এই নয় যে, পরিবেশগত নীতিবিজ্ঞান আনন্দ উপভোগকে অস্বীকার করার কথা বলে। সমাজের অগ্রগতির জন্য উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন, তবে এর জন্য চাই সংযতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার। পরিবেশগত নীতিবিদ্যা একথাই বলে যে, প্রকৃতি-পরিবেশকে ব্যবহার করার সময় মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। একান্ত প্রয়োজন না হলে, কেবলমাত্র কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখের বিনিময়ে, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা, বাস্তুসংস্থানের ক্ষতিসাধন করা, অনুচিত কর্ম।